দৈনিক খবর

তারিখ 05 JAN 1989
পৃষ্ঠা ... 5 কলাম 3 ...

6

মতামত

গ্রাম্য পাঠশালা প্রসঙ্গে

শিক্ষা মানব জীবনে অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষা জীবনে পূর্ণতা দান করে। শিক্ষাবিহীন জীবন পশুর অধম। সর্বোপরি বলা যেতে পারে মানব জীবনে জাগতিক ও পারলৌকিক ক্রিয়া-কর্মে শিক্ষার ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

এমন কি বিবাহিত মহিলাগণও অন্তরে এরকম আশা পোষণ করে যে, রাজরাণী হতে পারিনি সত্য, কিন্তু সন্তানকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে রাজ মাতা হবো। এই চিন্তা-চেতনার মধ্যে শিক্ষার গুরুত্ব নিহিত।

বিংশ শতাব্দীতে শিক্ষা কেবলমাত্র আভিধানিক শব্দই নয়, শিক্ষা মানুষের জ্ঞানচক্ষু উন্মোচনে, অসাধ্য সাধনে বা আশাতীত সাফল্য অর্জনের প্রধান বাহন। তাই শিক্ষা আজ মানুষের দ্বারে দ্বারে দেদীপ্যমান।

তবে সুধী পাঠক, আজকের আলোচ্য বিষয় আমার তা নয়, আমার বক্তব্য বিষয় হচ্ছে 'গ্রাম্য পাঠশালা'। গ্রাম্য পাঠশালার হাল-হকিকত, শিক্ষকদের শিক্ষাদান ও কর্তব্য-কর্মের গতি-প্রকৃতি তুলে ধরাই আমার উদ্দেশ্য। গ্রাম্য অশিক্ষিত পিতা-মাতার সন্তান-সন্ততির শিক্ষা গ্রহণের প্রশ্নে সঠিক অভিব্যক্তি কি? গ্রামের মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত বিশেষ করে নিরক্ষর চাষী ও অন্যান্য পেশাজীবীদের সন্তানরা পাঠশালায় যায়। মধ্যবিত্ত সমাজ আজ নিঃশেষিত। তবুও এক বুক আশা অন্তরে বেঁধে সন্তানদের তারা বিদ্যালয়ে পাঠায়। এই আশায় যে, ছেলে আই এ / বি এ পর্যন্ত না যাক, অন্ততঃ এসএসসি পাস করার পর ছোট-খাট একটা চাকরি পাবে এবং মা-বাবার ভগ্ন সংসার আবার পুনরুজ্জীবিত হবে।

বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, কোথাও কোথাও ইটের ঘর-দোরও গড়ে উঠেছে। আবার এমনও দেখা যায়, কোন কোন বিদ্যালয়ের চেয়ার-বেঞ্চির অভাব, কোন কোন বিদ্যালয়ের ঘরে বেড়া নেই এবং বর্ষার সময় ছাদ দিয়ে জল চুয়াতে থাকে। প্রাথমিক বিদ্যালয় পূর্বে ছিল আধা-সরকারী। বর্তমানে সরকারী পূর্বে প্রধান শিক্ষকদের বেতন ছিল ৩৬/৫০ টাকা। বহু ত্যাগ-তিতিক্ষার পর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ আজ সরকারী অফিসারদের সমপর্যায়ের সুযোগ-সুবিধা লাভ করছেন। তাদের আর্থিক দৈন্য অনেকাংশে লাঘব হয়েছে বৈকি। কিন্তু শিক্ষাদানের মান ও স্বেচ্ছাচারিতার প্রক্রিয়া আগের মতই আছে।

শিক্ষকগণ পদ-মর্যাদা লাভ করেছেন। বেতনও পূর্বাপেক্ষা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। বলা বাহুল্য, শিক্ষকগণ সরকারী কর্মচারী হলেও এদের বদলীর কোন ব্যবস্থা নেই। তাই স্বেচ্ছাচারিতায় গ্রাম্য শিক্ষকগণ আজ গা ভাসিয়ে দিয়েছেন। পূর্বে ছিল আধা-সরকারী চাকরি। বেতন ছিল নগণ্য। হয়তো বা বলবার কিছু ছিল না। আজ তারা সরকারী অফিসার এবং আর্থিক দৈন্যমুক্ত ও ক্ষমতার অধিকারী। তাই ইচ্ছামাফিক বিদ্যালয়ে উপস্থিত এবং অনুপস্থিত থাকা তাদের মনে হয় খেয়াল-খুশীর ব্যাপার। কেউ কিছু বলতেও পারে না।

গ্রামে শক্তিশালী বংশে বিয়ে করে বসেছে, সন্তান-সন্ততি বিয়ে দিয়ে আত্মীয় স্বজন করেছে, চেয়ারম্যান ও মেম্বরদের ভাই-ভাতিজা। অর্থ দৈন্যমুক্ত গ্রাম্য শিক্ষকগণ কোথাও কোথাও দ্বন্দ্ব-সংঘাতের গুরুঠাকুর। কালে-ভদ্রে শিক্ষা অফিসার বিদ্যালয় পরিদর্শনে যান। আবার অনেক শিক্ষক পরিদর্শনের খাতা শিক্ষা অফিসে গিয়ে শিক্ষা অফিসার দ্বারা ইচ্ছামাফিকভাবে লিখিয়ে নেন। অভিজ্ঞতার আলোকে আমি বলছি, কারণ আমিও একদিন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক ছিলাম। অবশ্য তখন প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো ছিল আধা-সরকারী। আবার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে (উত্তর নারায়ণপুর, ঝিনেদা) সহকারী প্রধান শিক্ষক হিসেবেও প্রায় ৫/৬ বছর শিক্ষকতা করেছি। অনেক ছাত্রকে সেই সময় এ বি সি নতুন করে শিখাতে হতো। হয়তো শিক্ষার মান কিছুটা উন্নতি হয়েছে। তবে এটাও রূঢ় সত্য, পূর্বে অর্থাৎ পাকিস্তান আমলের প্রথম দিক পর্যন্ত বললে ভুল হবে না যে, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণী অবধি শিক্ষা অর্জনের পরে জি টি পড়ে এসে ওই সব ক্লাসে শিক্ষাদান করতে দেখা যেতো। তাদের প্রশংসায় গ্রামবাসী আজও পঞ্চমুখ।

আজকাল প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাচারিতা অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে নির্দ্বিধায় একথা বলা যেতে পারে। শিক্ষকগণ আমলাতন্ত্রের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। কারণ সঠিক পদক্ষেপের অভাব।

সর্বোপরি আমি বলতে চাই, গ্রাম্য শিক্ষকদের প্রয়োজন মোতাবেক বদলীর ব্যবস্থা করে স্বেচ্ছাচারিতার মূল্যোৎপাটন করা সমীচীন। সরকারী গ্রাম্য পাঠশালার প্রতি বিমাতাসুলভ মনোভাব দূর করে আন্তরিকতার সাথে এগিয়ে আসতে হবে। শহরে যেমন শিশুদের চিত্ত বিনোদনের ব্যবস্থা আছে, গ্রামে তা নেই। গ্রাম্য পাঠশালায় বিনামূল্যে পুস্তক কর্তৃপক্ষ বিতরণ করে সত্য, কিন্তু যদি প্রকৃত শিক্ষার আলো না পায় বা অধিকাংশ ছেলে-মেয়েই অন্ধকারে থাকে, বাইরের জগতের সাথে তাদের পরিচয় না ঘটে তাহলে এ জাতি ধ্বংসের পথে পা বাড়াবে। জাতীয় উন্নতি ও সমৃদ্ধির সম্ভাবনা নস্যাৎ হয়ে যাবে। তাই গ্রামের পাঠশালা অর্থাৎ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যে সমস্ত ছেলে-মেয়ে লেখাপড়া করছে তাদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে তথা জাতির ভবিষ্যতের কথা ভেবে এ ব্যাপারে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার।

দিলীপ বোস

প্রগতিশীলী ছাত্র সমাজের কাছে প্রত্যাশা

সম্প্রতি ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ বাংলাদেশের ছাত্র সমাজের সাহসী প্রতিনিধি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। বিশেষ করে দেশের ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতিতে তাদের ভূমিকা আমাদের আশাবাদী করে তুলেছে। এদেশের ছাত্র সমাজ ছাড়া কোন আন্দোলন সম্পূর্ণ হয়নি এবং তারা আন্তরিক হলে যে কোন কঠিন সমস্যা থেকে জাতিকে, ছাত্র সমাজকে বাঁচাতে পারে। বন্যা পরিস্থিতিতে তাদের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা সেকথাই প্রমাণ করে। বর্তমানে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ সাম্প্রদায়িক শক্তিকে উচ্ছেদের কর্মসূচী নিয়েছে। জাতীয় রাজনীতিতে যখন দোলুল্যমানতা তখন তাদের এ পদক্ষেপে যেন একটু আশার আলো দেখতে পেলাম। দেশের ছাত্র সমাজ শিক্ষাঙ্গন থেকে সাম্প্রদায়িক শিবির চক্রের উচ্ছেদ চায় অথচ তা এ যাবৎ থেকেছে অবহেলিত। এই নরঘাতকদের উচ্ছেদের (রাজনৈতিকভাবে) দু'একটি পদক্ষেপের কথা বিবেচনার জন্য পরিষদের কাছে জোর দাবী জানাচ্ছি।

(১)দেশের বিশ্ববিদ্যালয়, ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেডিকেলে ভর্তি হয়ে গেলে আমরা যে সব গাইড ভর্তি সহায়িকা হিসেবে কাছে পাই তার অধিকাংশই স্বাধীনতা বিরোধী শিবির চক্রের শ্লোগান সম্বলিত। আমরা জানি ওরা দেশের ছাত্র সমাজের শত্রু। তা সত্ত্বেও ওদের গাইড আমাদের পড়তে হচ্ছে। জানি এই ঝকঝকে গাইডের অর্থ সংকুলান হয় পেট্রো ডলারের সাহায্যে। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদভুক্ত সংগঠনগুলোর গাইড বের করার আর্থিক সামর্থ্য নেই (অবশ্য ছাত্র ইউনিয়ন, বুয়েট, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়সহ কোথাও কোথাও গাইড বের করে থাকে)।

কিন্তু ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ভূমিকা নিলে তা ব্যাপকভাবে বেশ সহজেই বের করতে পারে। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিচ্ছু ছাত্ররা তাদের কাঙ্ক্ষিত সাহায্য পাবে এবং মানসিক উৎপীড়ন থেকে রক্ষা পাবে। এবং এতে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাম্প্রদায়িক শক্তিকে চিরতরে নির্মূলের গুরুত্বপূর্ণ একটি পদক্ষেপ বাস্তবায়িত হবে। আমার জোর আবেদন এবং আকাঙ্ক্ষা আসছে ভর্তি পরীক্ষায় ভর্তিচ্ছু ছাত্ররা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের গাইড হাতে পাবে।

(২)সিলেটে তিনটি বন্ধু শহীদ হওয়ার পর পরিষদ দেশব্যাপী ব্যাপক প্রচার (বিশেষতঃ সচিত্র পোস্টারসহ) চালাবে— আমাদের সে ধারণা বাস্তবায়িত হয়নি। আশা করি পরিষদ এদিকে বিশেষ যত্ন নিবে— সাম্প্রদায়িক শক্তিকে গণবিচ্ছিন্ন করে দেশের বুকে দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে।

—হাসিব মোহাম্মদ হোসেন
টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ
ঢাকা।